ॐ

১। নগেন্দ্রর নৌকাযাত্রা

নগেন্দ্র হরিপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামের একজন মহা ধনী জমিদার। বয়স তার সবে মাত্র ৩০ বছর। তার স্ত্রীর নাম সূর্যমুখী। নগেন্দ্র এক প্রয়োজনে কলকাতা যাত্রা করলেন। সময়টি ছিল জ্যৈষ্ঠমাস, ঝড়ের সময়। তাই রওনা হবার আগে তার স্ত্রী সূর্যমুখী তাকে দিব্যি দিয়ে বলল — (i) ঝড়ের সময় নৌকা সাবধানে নিয়ে যাবে।
(ii) ঝড়ের সময় নৌকার মধ্যে থাকবে না।

দু-একদিন নৌকা ঠিকঠাকভাবেই অগ্রসর হল। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ একদিন প্রবল ঝড় - বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হল নগেন্দ্রকে। সূর্যমুখীর কথা রাখতে ও কিছুটা রহমত মোল্লা মাঝির কথায় তাকে নৌকা থেকে পাড়ে অবতীর্ণ হতে হল। এবং আশ্রয়সন্ধান করতে হল তাদের। এই সন্ধান কারণেই তারা এক গ্রামের (ঝমঝমপুর) এক ইট দ্বারা তৈরি প্রাচীন জীর্ণ সামনে হাজির হলেন।

২। দীপ নির্বাণ

ভিতরের আলোর খোঁজে নগেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। এবং সেখানে দেখতে পেলেন — শয্যাস্থিত এক প্রাচীনকে, যার অন্তিমকাল অতি নিকটে। আর তিনি জ্বরগ্রস্থ যার কাছ থেকে নগেন্দ্র তাদের দুঃখদুর্দশার কথা জানতে পারলেন। এবং অবগত হলেন, তাদের ফুরিয়ে যাওয়া সম্পদ সম্পর্কে। কিন্তু নগেন্দ্র বা এতক্ষণ সেই ঘরের মধ্যে থাকা বালিকাটির সম্পর্কে কোনভাবেই অবগত হতে পারেননি।

এই বালিকাটি আসলে কুন্দনন্দিনী। যার বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে, তার এই অন্ধ পিতার কারণে। যে তার শারীরিক অবস্থার কারণে, তার বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ঘরে থাকাকালীন নগেন্দ্র এ-সব বিষয়ে অবগত হলেন। পরে দীপ নিভলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ॐ

৩। ছায়া প্রত্যাগমন

এদিকে কৃষ্ণর বাবা মারা গেল। কিন্তু নিয়তির জাগরণে কৃষ্ণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্নের দেশে প্রবেশ করল। স্বপ্নে কৃষ্ণর মা -

(i) কৃষ্ণকে তার সাথে ~~স~~ যাবার অনুরোধ করল। স্থানটি ছিল অন্ধকার দেশ।

(ii) কৃষ্ণকে ভবিষ্যতে হওয়া দুর্ঘটনার সাথে পরিচয় করালো, যেখানে সে এক নারীমূর্তি ও এক পুরুষমূর্তি সম্পর্কে অবগত ~~হল~~ ~~করালো~~। হল।

(iii) দ্বিতীয়বার তাকে নিতে আসার প্রতিশ্রুতি ছিল।

কৃষ্ণ স্বপ্নভঙ্গ হবার পর সেই নারীমূর্তি ও পুরুষমূর্তি - দুটির মধ্যে থাকা প্রাণ দুটির সম্পর্কে অবগত হতে পারল না। কারণ নরেন্দ্র তার ঘরের মধ্যে এলেও - অন্ধকারে ও প্রচণ্ড তন্দ্রায় নরেন্দ্রকে খেয়াল করেনি।

৫। এই সেই

নরেন্দ্র মৃত্যুসংবাদ পেয়ে, গ্রামস্থ কিছু মানুষকে নিয়ে সৎকারের আয়োজন করতে লাগল।

এদিকে কৃষ্ণর বান্ধবী চাঁপা কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণের কাছেই থাকল। কৃষ্ণ, চাঁপাকে সমস্ত স্বপ্নের কথা খুলে বলল। প্রথমে তার বান্ধবী কিছুটা অবিশ্বাস করলেও, পরে সেই মানুষদুটির কথা জানতে চাইল। (যদিও কৃষ্ণ এখনও পর্যন্ত সেই মানুষ দুটিকে দেখায় নি। কৃষ্ণ সে কথা তার বান্ধবীর কাছে প্রকাশ করল।)

● কৃষ্ণর বাবা মারা যাওয়া, কৃষ্ণ এখন একা। আত্মীয় স্বজন বলতে কেউ নেই। তাই নরেন্দ্র সেকথা

ওঁ

জানতে পেরে - তোমায় তার বিবাহ দিতে চাইল। কিন্তু পণের অর্থ না পাওয়ায় কেউই তাতে সম্মতি দিল না। নগেন্দ্র ফলস্বরূপে নিরুপায় হল। আবার কুন্দনন্দিনী কায়স্থ, অর্থাৎ তার স্বজাতীয় হওয়ায় তাকে ফেলে যেতে নগেন্দ্রর মন চাইল না। এবং লোকমুখে জানতে পারল -

"শ্যামবাজারে ইহার এক মাসির বাড়ি আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো"

তাই কুন্দকে (কায়স্থ কন্যা ↑) সাথে নিয়ে চললেন তার সাথে কলকাতায়। কুন্দ তার স্বপ্নে দেখা পুরুষটিকে এতক্ষণে বুঝতে পারল।

৫। অনেক প্রকারের কথা

কলকাতায় এসে কুন্দর মেসোর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কুন্দ ও নগেন্দ্র উভয়েই এসে এখানে নগেন্দ্র এসে উঠল তার সহোদরা ভগিনী কমলমণির কাছে। এবং সেখানেই রাখা হল কুন্দকে। পরে পত্রের মাধ্যমে সূর্যমুখীকে জানানো হল কুন্দের কথা। পরে সূর্যমুখীর কাছ থেকে আর এক পত্র এল।

পত্র ***

সূর্যমুখী পত্রে প্রথম তামাসা করলেন। তার তামাসা এইরূপ -

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমায় ভুলিলে?"

তামাসা শেষ হল সূর্যমুখী তার আসল কথায় ফিরে আসে। আসলে সূর্যমুখী চায় তার ভাই তারাচরণের সাথে কুন্দের বিবাহ দিতে। কারণ এতদিন ধরে সে তার ভাইয়ের জন্য একটি ভালো মেয়ে খুঁজে চলেছিল। কিন্তু তারা তার নিজের ভাই নয়, এবং তার মা (শ্রীমতী) পালিয়ে যাওয়ায় কোন ভালো কায়স্থ ঘরে তার বিবাহ হচ্ছিল না। তাই সূর্যমুখী তাকে পাত্রী জানতে পারা মাত্র, নগেন্দ্রকে বলে -

"তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্বত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নয়তো আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম।"

ॐ

৬। তারাচরণ

তারাচরণ আসলে সূর্যমুখীর বাপের বাড়ির (কোন্নগর) এক দাসীর ছেলে। যার নাম শ্রীমতী। সে সূর্যমুখীকে লালন-পালন করেছে। এবং উভয়েরই সমবয়স্ক হওয়ায়, সে তারাচরণকে নিজের ভায়ের মতোই যত্ন করে। এদিকে এর সূর্যমুখীর পিতা, তারাচরণকে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করেছিলেন – লোভের বশে নয়, দয়ালু মনোভাবের কারণে। কিন্তু পড়াশোনা বা ইংরেজি শিক্ষা খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি তারাচরণ।

পরে গ্রামে একটি স্কু সূর্যমুখীর দয়ায় একটি স্কুল স্থাপিত হলে, তারাচরণ তাতে মাস্টার হিসাবে নিযুক্ত হন। তাছাড়া সে দেবপুর নিবাসী জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রহ্মসমাজভুক্ত হন ও তার পারিষদ হয়ে উঠেন।

৭। পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কলকাতা থেকে ফিরে কুন্দ, এসে নগেন্দ্র দত্তের বাড়ি এসে উঠলেন। আর কুন্দ, অবাক হয়ে গেল – আসলে এটা বাড়ি নয়, একটা পুরী। সেই সেই পুরীর মধ্যে প্রবেশ করামাত্র কুন্দ স্বপ্নে দেখা সেই মহিলাকে নীরিক্ষণ করার সুযোগ পেল। কিন্তু সেই নারীমূর্তিকে দেখে সে সুস্থ হল না। বরং তার আশীর্বাদ পেল ও শান্ত রূপ দেখতে পেল। আবার হীরার সাথে কুন্দের পরিচয় প্রধান থেকেই।

৮। পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ

ইতিমধ্যে কুন্দের সাথে তারাচরণের বিবাহ হল। তবে এই নতুন বউকে তারাচরণ বাড়ির বাইরে নিয়ে গেল না।

ॐ

বাড়ির বাইরে, বলতে এখানে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু তারাচরণ বিবাহের পূর্বে থেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিল। সেখানে যে নারীশিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার প্রচার ছিল। কিন্তু আজ তারাচরণ স্ত্রীকে নিয়ে ভীত হল। দেবেন্দ্রনাথ সেই আবার দেবেন্দ্রনাথ, সেই ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নূতন বউকে দেখাতে চাইল। কিন্তু একবার কুন্দর লজ্জা হেতু; আর অন্যবার সূর্যমুখীর প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রর সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল।

বিবাহের তিন বছর পর জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তারাচরণ মারা গেল। সূর্যমুখী কুন্দকে গোবিন্দপুরে এনে আশ্রয় দিলেন। এখান থেকেই মূল 'বিষবৃক্ষ' শুরু —

৮। হরিদাসী বৈষ্ণবী

এবার দেবেন্দ্র বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশে এসে পৌঁছালেন গোবিন্দপুরে। কীর্তনের নাম করে সে প্রথমে গান শোনালেন, পরে কুন্দকে লোভে ভিড়ালেন —

" তোমার আশ্রিতকে কাঁদাতে চেয়েছি। "

— এই বলে। কিন্তু কুন্দ সে কথা গ্রাহ্য মাত্র করিল না। আসলে দেবেন্দ্র কুন্দকে কাছে পেতে চাই। পরে সূর্যমুখী সমাচার জেনে বৈষ্ণবীকে বিদায় করলেন।

১০। বাবু

হরিদাসীর ছদ্মবেশ পরে তিনি এলেন, তার বাসস্থান দেবীপুরে। এখানে এসে সে তার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করল। এবং রেলিং দিয়ে ঘেরা এক উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করল এমন কারুকারি-খানা হাবেলী। পরে গেল বৈঠকখানায়।

★ দেবেন্দ্রর পরিচয়

দেবেন্দ্রর বয়স ২৫ বছর (25)। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েই

একই ভাবের দুটি ভিন্ন আধার রূপ মাত্র। অর্থাৎ একই সংস্পৃষ্ট। কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে বিবাদের কারণে দেবেন্দ্রর পিতা সম্পত্তি হারিয়েছে। পরে দেবেন্দ্রর পিতা সম্পত্তি ফিরে পেতে দেবেন্দ্রর বিবাহ দিলেন হৈমবতী নামের (জমিদারের একমাত্র কন্যা) মেয়ের সাথে। কিন্তু হৈমবতীর আচরণে দেবেন্দ্র সন্তুষ্ট না হয়ে, গৃহত্যাগী হন। কলকাতায় যান। সেখানে ব্রাহ্ম সমাজের চালচলন শিখে আসেন। দেবীপুরে ফিরে ব্রহ্মসমাজ নির্মাণ করেন। সেখানে তিনি নারীশিক্ষার কথা বলতে থাকেন, এবং নারীদের ঘরের বাইরে বার করাতে চান। বিধবা-বিবাহ করায় তার বড় উৎসাহ।

॥ সূর্যমুখীর পত্র

এই পত্রটি সূর্যমুখী নগেন্দ্র তথা তার ভগিনী কমলমণির উদ্দেশ্যে রচনা করেন। পত্রটির গুরুত্ব ঠিক কতটা তা সূর্যমুখীর ভাষায় প্রকাশ পায় –

"তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালোবাসে না"

এই পত্রের মাধ্যমে কমলমণির কাছে সূর্যমুখী দুটি বিষয় পেশ করেছেন –

(i) কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার স্বামীর দুর্বলতা :– কুন্দনন্দিনীর প্রতি যে তার স্বামী নগেন্দ্রর কিছুটা দুর্বলতা। অর্থাৎ, তাদের দুজনার মধ্যে প্রেমের যে একটা বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তা সূর্যমুখী এ পত্রের মাধ্যমে কিছুটা খোলাসা করেছেন। কিন্তু তার স্বামীর ব্যবহারে – তা বোঝা যায়না বলেও উল্লেখ করেছেন। ও বলেন –

"কেন আমি আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?"

(ii) স্বামীর মন :– আবার তিনি পত্রের প্রকারান্তরে

শ্রী

তার প্রতি তার স্বামীর মনের কথা বলাতেও তৎপর হয়েছেন। তার চরিত্রকেও তিনি কোনরকমভাবে কলঙ্কিত করেননি। আসলে তিনি কমলমণিকে বলার চেষ্টা করেছেন —

"রত্ন অন্ধ, ভালোবাসা অন্ধ, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি - আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝতে পারি।"

তবে যাইহোক এই চিঠির প্রত্যুত্তরে কমলমণী, তার তার এ সমস্ত চিন্তাভাবনা বেকার বলে মনে করে, ও বলে —

"স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না - তাহার মরাই মঙ্গল।"

২। অঙ্কুর

যত দিন যেতে লাগল, নগেন্দ্রর চরিত্রের পরিবর্তন হল। সূর্যমুখী ভাবল নগেন্দ্রর কোন ব্যাধি/রোগ হয়েছে। তাই সে ডাক্তারের কাছে ওষুধ এনে নগেন্দ্রকে খাওয়াতে গেলে নগেন্দ্র তা ফেলে ফেলে দিল। সূর্যমুখী তাকে তার নিজের শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে অবগত করালে, নগেন্দ্র বলল —

"আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়"

একদিকে দেওয়ানজি এসে, প্রজাদের সাহসের কথা উল্লেখ করল। আবার প্রজারা এসে তাদের প্রতি হওয়া অন্যায়ের কথা তুলে ধরল। নগেন্দ্র পরবর্তীতে তাদের আয়ত্তে করতে অক্ষম হল। কমলমণীকে এখানে আসার জন্য সূর্যমুখী প্রার্থনা করতে লাগিল ও ও পত্রখানি প্রেরণ করল।

৩। মহাসমর

সূর্যমুখীর পত্র পেয়ে, কমলমণি গোবিন্দপুর যেতে চাইলেন কিন্তু তিন ফেরার সময় এসে যাওয়ায় শ্রীশচন্দ্র আর রাজি হলেন না। তিনি কমলমণিকেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। (তবে এই পর্যায়ে আমরা সতীশবাবু বলে এক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই।)

ॐ

14। স্ত্রী অড়িল

কমলমণি শেষে পৌঁছাল নগেন্দ্রের বাড়ি। বাড়ি ভরপুর হয়ে উঠল। কিন্তু কমলমণি এখানে এসেছিল একটায় উদ্দেশ্য নিয়ে। এ- কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালোবাসে কিনা সেটা জানতে ও কুন্দকে এখান থেকে কলকাতায় নিয়ে যেতে। তাই সে কুন্দকে একদিন প্রশ্ন করে বসল —

" তুই দাদাবাবুকে বড় ভালোবাসিস - না? "

কুন্দর কোন উত্তর না পেয়েও, সে নিশ্চিত হতে কুন্দকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইল।

15। হীরা

এই সময়ে বৈষ্ণবী আবার দত্ত বাড়িতে গান গাইতে এলে, কুন্দর সাথে একাকারে তার কথাবার্তা শুনে সূর্যমুখীর সন্দেহ হয়। তাই সে, বৈষ্ণবীর আসল পরিচয় জেনে আসার জন্য হীরাকে নিযুক্ত করে। এবং বারাণসী শাড়ি দেবার কথা বলে।

*** হীরার পরিচয়

হীরা ভদ্রঘরের কায়স্থ কন্যা। নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতাকে গ্রামান্তর থেকে এখানে নিয়ে আসেন। প্রথমে হীরার মা দত্তদের বাড়িতে দাসীগিরি করত। পরে মেয়ে বড় হলে অর্জিত ধনে বাড়ি বানিয়ে এখানে বসবাস শুরু করে। এখন হীরার বয়স কুড়ি। এবং সে দত্তবাড়ির সবচেয়ে কম বয়সের একজন দাসী। তবে প্রবল বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে সে দাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

16। না

কুন্দনন্দিনী কলকাতায় যাবার কথা শুনে বড় দুঃখ পেয়েছিল। কারণ নগেন্দ্রকে সে ভালোবেসে ফেলেছিল। তাই কলকাতা যাবার কথা সে কল্পনা করতে- পারছিল না। আবার নগেন্দ্রের সাথে দেখা না হবার ভয় পাচ্ছিল

ॐ

এবং উদ্যানের মধ্যে বসে সে, মৃত্যুর আশায়-ভাবে রহিল। এমন সময় উদ্যানের মধ্যে নগেন্দ্র এল। সে বলিল —

“ কুন্দ! কলিকাতায় যাইবে? ”

কুন্দ, তাকে নিজের অনিচ্ছার কথা জানালো। তখন নগেন্দ্র তাকে বিয়ে করার কথা বলল —

“ এখন বিধবা-বিবাহ চলিত হইতেছে — আমি তোমাকে বিবাহ করিব। ”

কিন্তু কুন্দ ‘না’ বলে অস্বীকার করল।

১৩। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হীরা, দেবেন্দ্রের পিছু নিতে নিতে দেবেন্দ্রর বৈঠকখানা পর্যন্ত পৌঁছে; দেবেন্দ্রর হাতে হীরা পড়ে গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র মদ্যপ অবস্থায় থাকায়, হীরা সেখান থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এল।

বাড়িতে এসে সূর্যমুখীকে এসব কথা বলাতে, সূর্যমুখী তাকে তাড়িয়ে দিতে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কমলিনী তাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

১৪। অনাথিনী

কুন্দ এ অপমান সহ্য করতে না পেরে, দত্ত বাড়ি থেকে পলায়ন করল। এবং ভাগ্যক্রমে গিয়ে উঠল হীরার বাড়ি।

১৫। হীরার রাগ

হীরা বাড়িতে একা থাকে না। সাথে থাকে আয়ি। তাই হীরা তাকে নিজের কাছে শুতে দেয়, খাবার দেয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার সময় চাবিও দেয়।

এদিকে আবার দেবেন্দ্র কুন্দকে কাছে পাবার জন্য [illegible] মালতি গোয়ালিনীর দ্বারা হীরাকে ডেকে পাঠায়। এবং হীরাকে অর্থের লোভ দেখিয়ে, — কুন্দকে তার হাতে তুলে দিতে বলে। হীরা রেগে যায়, তার এই প্রলোভনের কারণে।

ঔঁ

২০। হীরার প্রেম

~~এ একদিকে দত্ত বাড়িতে~~

একদিকে দত্ত বাড়িতে কুন্দকে খোঁজার জন্য লোক পাঠানো হল। সাথে — সোনার হার পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হবে এমনটাও জানা গেল। হীরা আর লোভ সামলাতে পারল না। সে একবার ভাবলো কুন্দকে ঐ বাড়ির হাতে তুলে দিবে, কিন্তু কুন্দ ফিরতে রাজি হবে না। তাই সে দ্বিতীয়বার ভাবলো, কুন্দকে দেবেন্দ্রর হাতে তুলে দেবে। কিন্তু তাতেও হীরার মন সম্মতি দেয় না। তাই সে শেষবারের মত ভাবলো কুন্দকে দিয়ে সে নগেন্দ্রকে বশ মানাবে ও সূর্যমুখীর ক্ষতি করবে। কারণ সূর্যমুখীর সুখ তার আর সহ্য হয় না।

২১। হীরার কলহ — বিষবৃক্ষের মুকুল

হীরা তার সেই চিন্তার প্রতিফলন ঘটালো। সে ইচ্ছা করে কৌশল্যার সাথে কলহ করল। এবং কৌশল্যাকে দাসীর কাজ থেকে বিতাড়িত না করলে, সে কাজে আসবে না বলে মিথ্যা অভিযোগে লিপ্ত হল। এবং ছলনা করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

এবং নগেন্দ্রর কাছে গিয়ে এ সমস্ত দায় সূর্যমুখীর উপর ন্যস্ত করল, এবং তাকে জানিয়ে দিল সূর্যমুখীর কুন্দকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে।

নগেন্দ্র বাড়ি ফিরে সূর্যমুখীকে ভর্ৎসনা করল। এবং কুন্দকে না ফেরাতে পারলে — দেশান্তরি হবার ভয় দেখাল।

ॐ

২২। চোরের উপর বাটপাড়ি

এদিকে গোয়ালিনী ছলে, বলে, কৌশলে হীরার বাড়িতে কুন্দকে নিয়ে গেল। এবার সব কথা দেবেন্দ্রকে গিয়ে জানিয়ে দিল। দেবেন্দ্র হীরার বাড়িতে আসার পরিকল্পনা করল

২৩। পিঞ্জরের পাখী

এবার কুন্দ নগেন্দ্রকে দেখার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। সেই লোভেই সে হীরার বাড়ি ত্যাগ করে নগেন্দ্র যে উদ্যানে প্রাতঃকালে ভ্রমণ করে, সেই উদ্যানে লুকিয়ে থাকল। কিন্তু আজ তার ভাগ্য খারাপ। সে ধরা পড়ে গেল সূর্যমুখীর হাতে। সে কুন্দকে বাড়িতে নিয়ে গেল।

২৪ ~~২৫~~। অবতরণ

দেবেন্দ্র কুন্দর খোঁজে এসে পৌঁছাল হীরার বাড়ি। কিন্তু সেখানে কুন্দ নেই দেখে, হীরার কাছে জানতে পারল সে দত্তবাড়িতে পৌঁছে গেছে। তাই দেবেন্দ্র হীরার সাথে জল্পনাতে মেতে উঠলেন। যাতে পরে হীরা তাকে তাড়িয়ে দিল।

*** ২৫। খোস - খবর (পত্র)

এইবার নগেন্দ্রর সাথে কুন্দর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। তাই সূর্যমুখী এক পত্র কমলকে পাঠালেন। যেখানে তিনি —

① নগেন্দ্রর বিবাহের কথা জানালেন :— তিনি কমলমণীকে ~~কোমলমণীকে~~, নগেন্দ্রর বিবাহ বিষয়টি জানালেন। এবং তাঁদের ঘটক যে তিনি নিজে — একথাও উল্লেখ করলেন। দু-একদিনের মধ্যে বিবাহের প্রসঙ্গ আসায়, সে কমলমণীকে আমন্ত্রণ জানাতে পারল না — এমনটাও তিনি লিখলেন।

এই পত্র পাওয়ায় শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে একখানি পত্র লিখলেন। আর প্রত্যুত্তরে নগেন্দ্র লিখল —

ॐ

"ভাই! আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলেকে আমায় ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্থ হইব।"

২৬। কাহার আপত্তি?

পত্র পড়িয়া কমলমণি, শ্রীশচন্দ্র সহ গোবিন্দপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যাতে করে বিবাহ বন্ধ করা যায়। কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছে জানতে পারল কাল বিবাহ হয়ে গিয়েছে।

২৭। সূর্যমুখী ও কমলমণি

এই বিবাহের পর সূর্যমুখী, কমলের কাছে বিলাপ করল ও সেই রাতেই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেল। সকালে বিছানায় কোমলমনি তার লেখা একটি পত্র পেল।

২৮। অভিমান পত্র

এই পত্রে সূর্যমুখী তার বিলাপ ব্যক্ত করেছেন, এইভাবে—

(ক) স্বামী দান:— নগেন্দ্র, কুন্দনন্দিনীকে না পেলে পাগল হবে, তাই তার সুখের জন্য স্বামীকে তার হাতে দান করলাম ও নিজে গৃহত্যাগী হলাম—

"কুন্দনন্দিনীকে পুনর্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম।"

(খ) স্বামীর প্রনাম:— তিনি কমলমণীকে জানালেন তিনি যেন তার স্বামীর চরণে কোটি কোটি প্রণাম, তার তরফ থেকে তার স্বামীকে জানান। কারণ তাকে পত্র লেখার সাহস তার নেই।

ওঁ

(ই) কমলমণিকে আশীর্বাদ :- পত্রের শেষের দিকে সে কমলমণিকে আশীর্বাদ জানান, যেন সে তার স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত না হন। আর যদি কোনদিন হন, তাহলে সেদিন যেন কমলমণির শেষ দিন হয়।

২৩। বিষবৃক্ষ কি?

নগেন্দ্রকে ভগবান অসাধ্য সুখ দিয়েছেন। তাই সে কুন্দকে দেখে তার লোভ সংবরণ করতে পারেনি — সেটি আসলে বিষবৃক্ষ

৩০। অন্বেষণ

নগেন্দ্রর গৃহশ্মশানে বেশ হল, সূর্যমুখীকে খোঁজার জন্য সে চারিদিকে লোক পাঠাতে থাকল। যদিও তাকে একবার খানসামা বৃক্ষের পাশে দেখেছিল, সে আসতে রাজি হয়নি।

৩১। সকল সুখেরই সীমা আছে

এবার সূর্যমুখীর পালানোর দায় এসে পড়ল কুন্দনন্দিনীর ওপর। নগেন্দ্র তার মুখ দেখাতে পর্যন্ত অস্বীকার করল। শেষে কুন্দনন্দিনী নিজেকেই দোষী ভাবতে লাগল।

*** ৩২। বিষবৃক্ষের ফল

এবার নগেন্দ্র হর ঘোষালকে পত্র লিখলেন, সেখানে তিনি দেখালেন —

(A) সূর্যমুখীর ~~প্রীতি~~, প্রীতি :- এখানে তিনি সূর্যমুখীর প্রতি প্রীতি দেখালেন। এবং তার খোঁজেই গৃহত্যাগী হবার কথা ঘোষণা করলেন।

(B) কুন্দনন্দিনীকে ঘৃণা :— আবার তিনি উল্লেখ করলেন কুন্দনন্দিনী তার দুঃখমূল হয়েছে।

একথা উল্লেখ করে দেওয়ানের ওপর ভার দিয়ে গৃহত্যাগ করে পর্যটনে গেলেন। আর হীরা দাসী কুন্দনন্দিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হল।

ॐ

৩৩। ভালোবাসার চিহ্নস্বরূপ

এমত সময়ে দেবেন্দ্র, কুন্দনন্দিনীর সাথে দেখা করতে হীরার সাথে যোগাযোগ করল। কিন্তু, মত্ত বাড়িতে লাথি খেয়ে দেবেন্দ্র হীরার প্রতি লোভে ফুঁসতে লাগল।

৩৪। পথিপার্শ্বে

সূর্যমুখী গিয়ে পড়ল এবার ব্রহ্মচারীর হাতে। আসলে বর্ষাকালে বৃষ্টিতে সংস্পর্শে ভিজে ও অনাহারে - সে পথের ধারে জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে ছিল। ব্রহ্মচারী তাকে উদ্ধার করে, এবং তার প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু সূর্যমুখী অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৩৫। আশাপথে

সূর্যমুখীর কি রোগ তা বুঝতে না পেরে, ব্রহ্মচারী ডাক্তার রামকৃষ্ণ রায় নামের বৈদ্যকে ডেকে পাঠায়। ডাক্তার বা বৈদ্য বলে তার কাশ রোগ ও জ্বর হয়েছে। তাই তার বাঁচার আশা নাই। তাই এবার, মরণ নিশ্চিত হওয়ায় সে একবার স্বামীকে শেষবারের মতো দেখতে চাইলেন। তাই ব্রহ্মচারী বা শিবপ্রসাদ শর্মা, নগেন্দ্রর উদ্দেশ্যে চিঠি লিখালেন -

ক) সূর্যমুখীর অবস্থান বর্ণনা:- ব্রহ্মচারী উল্লেখ করলেন সূর্যমুখী এখানে (মধুপুর) সংকটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে রয়েছে। বাঁচার আশা নাই। তাই যদি একবার শেষবারের মতো দেখা করতে আসে।

খ) গন্তব্যপথের বিবরণ:- ব্রহ্মচারী আরও লেখেন রানিগঞ্জ এসে মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সাথে দেখা করবেন। তিনিই সাথে লোক দিয়ে আমার ~~এ~~ এখানে পৌঁছে দিবেন।

ঔ

কিন্তু পত্র নগেন্দ্রর কাছে পৌঁছাল না। পৌঁছাল দেওয়ানের কাছে। দেওয়ান পত্র মারফত জানত যে মালিক কাশিতে রয়েছে। তাই অন্যান্য পত্রের সাথে সেই পত্র নগেন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলেন।

৩৬। হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

এবার দেবেন্দ্র, হীরাকে ডেকে তার সাথে ছলনা করতে চাইল।

৩৭। সূর্যমুখীর সংবাদ

নগেন্দ্র ও এতক্ষণে এসে পৌঁছাল মধুপুরে। এবং সেখানে জানতে পারল — সূর্যমুখী মারা গেছে (কিন্তু আসলে সূর্যমুখী মরেনি) শুধু রামকৃষ্ণ রায় আসলে নগেন্দ্রকে বলেছিল — সূর্যমুখী ঘরে আগুন লেগে মারা গেছে।

৩৮। এতদিনে সব ফুরাইল

এবার নগেন্দ্র তার সমস্ত কিছু দান করার কথা ভাবতে থাকল। এবং সূর্যমুখী যে খাটে শুত সেখানে একবার শোয়ার কথা কল্পনা করল ও সূর্যমুখীর সমস্ত কথা জড়ো আঁকড়ে ধরে বাঁচার পরিকল্পনা করল।

৩৯। সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরাইল না।

গোবিন্দপুর ফিরে নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের সাথে আলোচনায় বসল।

৪০। হীরার বিষবৃক্ষের ফল

হীরা এখন দেবেন্দ্রর কাছে তার দাসী হয়ে থাকতে চায়। কিন্তু দেবেন্দ্র আসলে তার ছলনা পূর্ণ করল। তাই হীরার শরীরে প্রতিশোধের লোভে মগ্ন হল।

৪১। হীরার আয়ি

হীরার আয়ি নগেন্দ্রর বাড়ির ডাক্তার খানায় হীরার জন্য ওষুধ আনতে গেল। ডাক্তার বলল হীরার হিস্টিরিয়া রোগ হয়েছে।

ॐ

৫২। অন্ধকার পুরী – অন্ধকার জীবন

কুন্দ আজ মনে মনে, সূর্যমুখীর সাথে (ঈর্ষা) করা তার অন্যায়ের আক্ষেপ করতে লাগল। আসলে সে সূর্যমুখীর মৃত্যু খবর জানত না।

৫৩। প্রত্যাগমন

কলকাতায় দানপত্র লিখিত হল। হরিপুরে তা রেজিস্ট্রি হবে। শ্রীশচন্দ্র হাজার বারণ করাতেও নগেন্দ্র তার কোন কথায় কান দিল না।

৫৪। স্তিমিত প্রদীপে

গোবিন্দপুরে ফিরে এসে নগেন্দ্র সূর্যমুখীর শয়ন ঘরে শোয়ার বন্দোবস্ত করল। কারণ এটায় তার শেষ স্মৃতিগুলির মাঝে একটি ছিল।

৫৫। ছায়া

কিন্তু সেই রাতে সূর্যমুখী ফিরে এল। তার সাথে নগেন্দ্রর পুনর্মিলন হল।

৫৬। পূর্ববৃত্তান্ত

সূর্যমুখী ফিরে এসে জানাল – সেদিন ব্রহ্মচারীর জন্যে আগুন লেগে সে মারা যায়নি।

৫৭। সরলা এবং সর্পী

সেদিন দেবেন্দ্র ফিরে এসেও ~~সরলা~~ কুন্দর সাথে দেখা না করায় কুন্দ মুষড়ে পড়ল। এবং স্বপনে মাকে তার মাকে দেখে – তার সাথে যাবার কথা জানাল।

এবার কুন্দ হীরার কাছ থেকে চুরি করে বিষ খেল। যে বিষ হীরা প্রতিশোধ হেতু দেবেন্দ্রকে মারার জন্য ডাক্তারের কাছ থেকে এ বিষ কিনেছিল।

ॐ

48। কৃষ্ণের কার্যতৎপরতা

সূর্যমুখীকে দেখে হীরা চমকে উঠল। ~~কিন্তু~~ হীরা সূর্যমুখী, কৃষ্ণকে দেখাতে এসে জানতে পারল কৃষ্ণ নিখোঁজ হয়েছে।

49। এতদিনে মুখ ফুটিল

কৃষ্ণের এতদিনে মুখ ফুটিল। এবং নারেন্দ্রর পায়ে নিজেকে আত্মঃ-সমর্পণ করে মারা গেল।

50। সমাপ্তি

কিন্তু কৃষ্ণ কোথায় নিখোঁজ গেল — সেই প্রশ্ন প্রধান উঠল সবাই হীরাকে সন্দেহ করল। কিন্তু হীরা সেখান থেকে পালিয়েছে।

তবে নারেন্দ্রর মৃত্যুর দু-চারদিন আগে হীরা পাগল অবস্থায় নারেন্দ্রকে দেখাতে এল। আর এই ঘটনা ঘটল কয়েক বছরের মধ্যে। নারেন্দ্রর রীতি বিষবৃক্ষের ফল ফলল।

NOTE — মোট 50 টা অধ্যায় আছে। আমার দাগ নম্বরে ভুল হল আছে।

Sounath Mondal
24/10/2025.